এরপর কার পালা

লাখো শহীদের রক্তে কেনা বাংলাদেশ আজ জ্বলন্ত নরকে পরিণত হয়েছে। মুক্তচিন্তা কিংবা দেশপ্রেমিকেরা এখন স্বাধীনতার শত্রুদের শিকার, নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে প্রতিটি স্বাধীনতার পক্ষের ব্যক্তি।মৌলবাদ ঘিরে রেখেছে পুরো দেশ। তাদের সর্বশেষ শিকার অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ, স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলায় রাজাকার পাকিস্তানি দালালদের তিরস্কার করায় তাদের মুখোশ উন্মোচন করার পরিণামে ফেব্রুয়ারিতে রক্তাক্ত হতে হলো ধর্মের ধ্বজাধারী তালেবানি পিশাচের হাতে। মৃত্যু থেকে এক সেকেন্ড দূরে থেকে ফিরে এসেছিলেন তিনি। একজন অধ্যাপক, ঔপন্যাসিক. কবি, কথাসাহিত্যিক ও গবেষক হিসেবে তিনি এ দেশে নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারেননি। প্রতিটি মুহূর্ত তাকে মৃত্যু তাড়িয়ে বেড়াতো, অপহরণের শিকার হতে হচ্ছিল তার সন্তানদের, বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকতে হতো তাদেরকে, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে মূলত দেশত্যাগে বাধ্য হন তিনি। কিন্তু মৃত্যুকে এড়ানো হয়নি আর! নশ্বর পৃথিবীর সব কিছু ফেলে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতি একটি আলোকিত তারা হারালো। তাঁর মৃত্যুতে দেশপ্রেমিক লেখকদের নিরাপত্তা আজ প্রশ্নবিদ্ধ। এরপর কার পালা? কার রক্তে রক্তাক্ত হবে বাংলার মাটি?

প্রান্ত প্রাণ, স্টেশন রোড, শ্রীমঙ্গল
Email-pranto-pran@yahoo.com

হায় বাংলাদেশ

প্রয়োজন প্রতিরোধ

আবারও বিদীর্ণ হলো দেশের গণতন্ত্র, প্রগতিশীল আন্দোলন। কার্যত ২১ আগস্ট ঘাতকচক্র সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করতে চেয়েছে দেশের গণতন্ত্রকে। এ উদ্দেশ্যেই তারা হত্যা করতে চেয়েছে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে। এখন সর্বত্র প্রশ্ন উঠেছে, কারা এই ঘাতকচক্র? সারা দেশে বোমাতঙ্ক সৃষ্টি করে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়। দৃশ্যত এ গোষ্ঠীর কার্যক্রম ও আস্ফালন দেখে সবাই আজ ধারণা করছে এ জঘন্য কাজের নেপথ্যে রয়েছে মৌলবাদী চরম প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। বিভিন্ন সরকারের সময় দেশের বিকাশমান মাদ্রাসা থেকেই মৌলবাদী চক্রের উত্থান। মাদ্রাসার ধর্মভিত্তিক শিক্ষা নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে। শাসক গোষ্ঠী কখনও কর্ণপাত করেনি। আজ সরকারি অর্থে পরিচালিত মাদ্রাসাগুলো হয়ে উঠেছে অস্ত্রবাজদের প্রতিষ্ঠান। মৌলবাদী সশস্ত্র ক্যাডারদের ট্রেনিং সেন্টার। দেরিতে হলেও আজ দেশের গণতান্ত্রিক দলগুলো এ বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করতে পারছে। দেশের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এখন শুধু প্রতিবাদ নয়, প্রয়োজন প্রতিরোধ গড়ে তোলা। তা না হলে ওরা দেশের সব সুন্দরকেই ধ্বংস করে দেবে। দেশকে নিয়ে যাবে আইয়ামে জাহেলির যুগে।

শামীম আহমেদ, আজিমপুর, ঢাকা

আমার স্বদেশ, আমার সরকার

কত স্বজনের জীবন গেলে দেশ নিরাপদ হবে? নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারবো? দিনে-দুপুরে বিরোধীদলীয় নেতার জনসভায় বোমা মেরে মানুষ হত্যা তো নিজের স্বদেশ হত্যার মতোই। পৃথিবী তো সামনে এগুনোর চেষ্টা করছে। আমরা কেন শুধু পেছনে হাঁটছি? প্রধানমন্ত্রী, এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আপনার কাছেই চাই।
প্রিয় স্বদেশ আমার বারবার বোমায় আক্রান্ত। আপনার সরকার প্রতিটি ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যর্থ। প্রশ্রয় পেয়ে বোমাবাজরা কোথায় পৌঁছেছে তাতো দেখলেনই ২১ আগস্ট। জনগণের টাকা পোষা গোয়েন্দারা কোনো ঘটনারই পূর্বাভাস দিতে পারছে না। আজ শেখ হাসিনা, কাল আপনি টার্গেট হবেন না, এর কোনো নিশ্চয়তা আছে কি? প্রতিটি বোমার ঘটনার সঙ্গে ইসলামী জঙ্গিদের দিকে আঙুল উঠেছে। সাপ্তাহিক ২০০০ জঙ্গিদের ছবি ছেপেছে। এরপরও আর কি প্রমাণ চাই! জামায়াত আপনার ক্ষমতার অংশীদার বলেই কি তাদের ধরছেন না? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনগণ হিসেবে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আমি জানতে চাই। আপনাকে ভোট দিয়েছি নিরাপদ জীবনের জন্য, সুন্দর বাংলাদেশের স্বপ্নে। তিন বছর ধরে আপনি আমাদের স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন। অপরাধী না ধরে রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করেছেন। আপনার কাজ দুষ্কৃতকারীদের ধরা। কাউকে দোষারোপ নয়। আপনার সরকারের ব্যর্থতায় প্রিয় স্বদেশ খামচে ধরেছে '৭১-এর পুরনো শকুন। হয় আপনি আমাদের নিরাপত্তা দিন, দেশকে বাঁচান নতুবা পদত্যাগ করে মুক্তি দিন। একটু স্বস্তির জন্য আর কতকাল আমাদের অপেক্ষা করতে হবে?

শিমু, মিরপুর, ঢাকা

সহযোগী নয় এরা সর্বগ্রাসী

বোমার আতঙ্কে এখন আমরা আতঙ্কিত সব সময়। আমাদের জীবনে দুর্নীতির মতো স্থায়ী রূপ নিয়েছে এ বোমা কালচার। জনসভা দেখলেই মনে হয় বোমা ফুটবে। আমরা আজ এ আতঙ্কের বাইরে যেতে পারি না। হয়তো আমার মতো অনেকেরই আজ এ অবস্থা। দিনে দিনে আমরা মুখোমুখি হচ্ছি কঠিন সময়ের। অনেকটা জোর করেই ঢোকানো হচ্ছে অস্থিরতা। কিন্তু কেন? এ প্রশ্ন যাদের কাছে করবেন তারা হয়তো সবই বোঝে, আবার কিছুই বোঝে না। কারণ তাদের সঙ্গীদের ওপর সবার আঙুল। ক্ষমতার পথে এই ইসলামী সংগঠনগুলো তাদের সহায়ক। বিএনপি মনে করে তাদের ছাড়া রাজনীতিতে বিশেষ করে ভোটের রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থান নড়বড়ে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে বোমা হামলার সুষ্ঠু তদন্ত তাহলে আসবে কোথা থেকে? এবং এ পর্যন্ত হয়েছেও তাই। তদন্ত হয়নি। বেরিয়ে আসেনি হামলাকারী সংগঠনগুলোর অপরাধ। দিনে দিনে তারা বেড়ে উঠছে আগাছার মতো। এভাবে বাড়তে থাকলে একদিন তারাই হয়তো হয়ে উঠবে মূল চরিত্র। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে সে পথেই চলছি আমরা। দুঃসময়ের মুখোমুখি আমরা। এ কথা নতুন নয়। এটা বুঝতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোর। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের। হয়তো তারা নিজেদের কথা চিন্তা করছে সামনের পাঁচ বছরের জন্য। কিন্তু দশ-পনেরো বছরের পরের অবস্থা কি ভাবতে পারে তারা! তখন হয়তো এই বিএনপিকে দেখা যাবে এক সময়কার সহযোগীদের সহযোগী হিসেবে।

নূর-উন-নবী, আজিমপুর, ঢাকা

মোবাইল কোর্ট এবং গাড়ির ফিটনেস

বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি। উদ্দেশ্য লোকাল বাসে চড়ে পয়সা বাঁচানো। কিন্তু একটা বাসও দাঁড়াচ্ছে না। ঘটনা কি! সাঁই সাঁই শব্দ করে তারা কোথায় যাচ্ছে! বাজপাখির মতো দৃষ্টি মেলে দেখি সামনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের গাড়িসহ আরো কিছু গাড়ি। তাতে পুলিশ ও বিডিআর বাহিনী। ও এই ব্যাপার! গাড়ির ফিটনেস দেখা হচ্ছে। মোবাইল কোর্ট বসেছে। ভেতরে ম্যাজিস্ট্রেট বসা। ওনারা গাড়ি ধরছেন এবং ফিটনেস পরীক্ষা করছেন। অতি উত্তম পন্থা। কিন্তু এই ঢাকা শহর বা এই দেশের কোনো গাড়ির বা যানবাহন কি ফিট? এর জবাব দিতে পারবেন বিআরটিএ (বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি)। কেননা তারাই একমাত্র ফিটনেস এবং চালকদের লাইসেন্সদানকারী প্রতিষ্ঠান। যদি আপনি কোনো বাস, মিনিবাস অথবা অন্য কোনো যানবাহনে চড়েন তবেই বুঝবেন (যদি এ ব্যাপারে আপনার কোনো ধারণা থাকে) ওটা কি চিজ বা বস্তু। যদি ড্রাইভারের পাশে বসেন তবে দেখবেন সেখানে স্পিডোমিটার, টার্নিং পয়েন্ট, লাইট পয়েন্ট, অয়েল মিটার কিছুই নেই। সব ফাঁকা। হুইলটা পর্যন্ত ধোলাইখাল প্রোডাক্ট। আর কতগুলো তার প্যাঁচানো, তার নিচে ক্লাচ প্যাডেল এক্সেলেটর সবই কিমাকার। স্টার্ট নেয়া মাত্রই বাস গর্জন করে তারপর হঠাৎই দৌড় দেয়। কিভাবে যে এগুলো চলে তা এ যানের ড্রাইভার সাহেবরাই শুধু জানেন। চাকার দমও থাকে না অনেকটায়। অনেক চাকা আবার রিসাইকেল করা। এহেন অবস্থায় এগুলোর তো ফিটনেস থাকার কথা নয়। কিন্তু তারপরও ঐসব যানবাহন চলে এবং মাঝে মাঝে দুর্ঘটনায় পতিত হয়। যাত্রীরা হয় নিহত কিংবা আহত। এই বেহাল অবস্থায় মোবাইল কোর্ট বসিয়ে সরকার কি করতে চাইছে? গাড়িগুলো কি রাতারাতি ফিট হয়ে যাবে! এখন আমার প্রশ্ন হলো গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালবেন না। এতে বরঞ্চ ক্ষতিই

হবে। আগে গোড়া ঠিক করুন, তারপর মোবাইল কোর্ট বসিয়ে গাড়ি চেক করুন এবং যাত্রীদের স্বস্তি দিন।

মাহবুব হারুন বাবু
পূর্ব মণিপুর, মিরপুর, ঢাকা

লিফট দুটোকে বাঁচাবেন

দেশে সরকারি অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজসহ যতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার প্রকৃত অবস্থা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না যে কতটুকু অবহেলা আর অযত্নে আছে সরকারি অফিসের জিনিসপত্র ও ব্যবহারিক সামগ্রী।

বেশ ক'দিন আগে মতিঝিল সমবায় সদন অফিসে ঢুকে যা দেখলাম তা স্বচক্ষে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবেন না। সত্যি ভাবতে অবাক লাগে, এ কেমন আমাদের অবহেলা আর দুর্বল ব্যবস্থাপনা? মতিঝিলে অবস্থিত এই ১০তলা সমবায় সদন অফিসের দু-দুটি লিফট বর্তমানে মানুষের লাথি আর থাপ্পড়ে ওঠানামা করছে। বিশ্বাস না হয় নিজে গিয়ে একবার দেখে আসুন। ঘটনাটি এমন- যদি আপনি নিচ থেকে ওপরে যেতে চান অথবা ওপর থেকে নিচে আসতে চান তবে নিশ্চয়ই লিফট সিগন্যালের সুইচ দ্বারা লিফট দাঁড় করানো হয়। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ উল্টো। কারণ লিফটের সিগন্যাল সুইচ নেই। সুতরাং জোরে শব্দ করে লাথি বা থাপ্পড় না দিলে লিফটম্যান টের পাবে না ওপর বা নিচে কেউ অপেক্ষা করছেন। প্রিয় পাঠক, লিফটের এই লাথি আর থাপ্পড় কতো বছর সইতে হবে জানি না। তবে লিফটম্যান বয়স্ক ভদ্রলোকটি জানালেন, প্রায় অর্ধযুগ যাবৎ এভাবে আঘাত সয়ে আসছে সমবায় সদনের এই লিফট দুটোর দরজা। তবে কি লিফট দুটো এভাবে সারা জীবন মানুষের লাথি আর থাপ্পড় খেয়েই যাবে?

রহমান শেখ
উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ

সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। আর শিক্ষার মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে আজ পর্যন্ত নানা রকম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে; যার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নতির দিকে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীগণ শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে আসছেন। কিন্তু তারা চাকরিতে প্রবেশ করেই হতাশার মধ্যে ভোগেন। কারণ তাদের বর্তমানে যে স্কেলে বেতন প্রদান করা হয় তা খুবই লজ্জাজনক। পিয়নের একধাপ স্কেল ওপরে প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থান। অথচ একজন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রতিদিন কমপক্ষে ৮ থেকে ১০টি ক্লাস নিতে হয়; এছাড়া বিভিন্ন অফিসিয়াল কাজ তো রয়েছেই। সীমাহীন বেকারত্বের কারণে বর্তমান সময়ে চাকরি পাওয়া কঠিন বলে সবাই এই পেশায় থাকছেন কিন্তু মনোযোগ দিয়েই কাজ করতে পারছেন না বেতন বৈষম্যের কারণে। অথচ উন্নত বিশ্বে প্রাথমিক শিক্ষকদের উচ্চতর বেতন দেয়া হয়; আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে উন্নত বিশ্বের মতো না হলেও অন্তত উচ্চশিক্ষিত সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মানসম্মত বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং পে-কমিশনের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নাম প্রকাশে অনচ্ছিুক, বগুড়া

নীল দংশন

সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠক ফোরামে ১৩ আগস্ট সৈকত হোসেনের 'নীল দংশন' লেখা পড়ে আমার খুব ভালো লাগলো। তিনি মেয়েদের লোভকে সামাল দেয়ার কথা বলেছেন। সত্যিই মেয়েরা এসব বিকৃত রুচির ছেলেদের গাড়ি, বাড়ি, ফ্ল্যাট এবং সুন্দর কথা ও সুন্দর চেহারায় মুগ্ধ হয়ে তাদের সঙ্গে মিশে পরবর্তী সময়ে পরিবারের, সমাজের সম্মানহানি ঘটায়। মেয়েরা একবারও চিন্তা করে না যে, একটা ছেলের বংশ পরিচয়, রুচিবোধ কেমন? অবশ্য একটা ভালো ছেলে অর্থাৎ ভালো মানের ছেলেরা এরূপ শাহীনদের মতো বিকৃত রুচির হতে পারে না। মেয়েরা দয়া করে আপনারা ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করে এগিয়ে চলুন, নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস অর্জন করুন। অন্যের জিনিসের প্রতি লোভে পড়ে নিজের সম্মান, ব্যক্তিত্ববোধ বিসর্জন দেবেন না। কারণ লোভ পরবর্তীতে ধ্বংস ডেকে আনে। বর্তমানে শাহীনদের মতো বিকৃত রুচির খপ্পরে যারা পড়েছে সেসব ভুক্তভোগী মেয়েরাই ভালো করে জানে সে কি হারিয়েছে? যা আর হাজার চেষ্টা করেও ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়।

ইসরাত বিনতে ইকবাল ঈভা
চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ
নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম

হুমায়ূন আহমেদের প্রতি

নন্দিত ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদকে উদ্দেশ্য করে মূলত এই চিঠি। যদিও ভালো করেই জানি, একজন সামান্য পাঠকের এই চিঠি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করবে না। লেখকের লেখা সম্ভবত এমন কোনো বই বা নিবন্ধ নেই, যা আমি পড়িনি। সাম্প্রতিককালে হুমায়ূন আহমেদের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাকে অন্য সবার মতো অধঃপতন হিসেবে না দেখে বরং উন্নতি হিসেবেই ভেবেছি আমি। যুক্তি ছিল এর মধ্য দিয়ে তিনি ছলনা থেকে দুটি নারীকেই মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'অহক' বইটি কেনার পর স্তম্ভিত হয়েছি। দুঃখ পেয়েছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি দৈনিকে বইটির বিজ্ঞাপনের চটকদার ভাষা পড়ে মূলত আগ্রহী হয়ে 'অহক' নামের বইটি কিনি। মোট ১৮৪ পৃষ্ঠা কলেবরের এবং ১২৫ টাকা মূল্যমানের এই বইটিতে মোট ১১টি রচনা স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৪টি রচনা নতুন যেগুলোর কলেবর মোট ৪৬ পৃষ্ঠা। বাকি ৭টি রচনাই ইতিপূর্বে অন্যান্য প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে, অন্য প্রকাশ থেকে ২০০২ সালের একুশে বইমেলায় প্রকাশিত 'দ্বিতীয় মানব' শীর্ষক পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসটিও ছেপে দেয়া হয়েছে এই বইটিতে। আমি 'অহক' বইটির প্রকাশকের দোষ দিতে চাই না। কারণ তারা টাকার জন্য এটা করেন। কিন্তু একজন হুমায়ূন আহমেদ এ ধরনের ব্যবসায় সহযোগিতা করেন কীভাবে? স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে- লেখকদের জন্য প্রকাশকদের জন্ম, নাকি প্রকাশকদের জন্য লেখকদের জন্ম? হুমায়ূন আহমেদের বই লেখার প্রতিভা কি দিনে দিনে শেষ হয়ে যাচ্ছে? তা না হলে এমন কাজ করবার কারণ কি? পুরনো লেখা ছাপিয়ে বই মোটা করে বেশি টাকা আদায়ের অর্থ কি ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নয়? আমার মতো পাঠকদের আপনার মতো লেখকের, প্রকাশকদের কাছে অনুরোধ, দয়া করে রাজনীতিবিদদের মতো অসুস্থ আচরণ করবেন না। আর পাঠকদের বিশ্বাস এবং কষ্টার্জিত টাকা ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা বাদ দিন।

সুরাইয়া
ঢাকা

এবার যুদ্ধ মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের

আমাদের দেশটি খুবই দরিদ্র। এমনিতেই আমাদের জীবন ধারণে প্রচন্ড কষ্ট করতে হয়। অনেক শ্রমের বিনিময়েও সংসারের খরচ নির্বাহ করা যায় না। তবুও আমরা চলছিলাম। দেখতে চেষ্টা করছিলাম শুভ দিনের স্বপ্ন। কিন্তু এবার বন্যায় আমাদের সে স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেছে। প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। ১ লাখ ৭০ হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে। ১ হাজার কোটি টাকার গবাদি পশু মরে গেছে। ১২০০ গার্মেন্টস কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাজার হাজার কলকারখানা ধ্বংস হয়ে গেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থা অচল হয়ে গেছে। বহু স্কুল-কলেজ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অসংখ্য রাস্তাঘাট, পুল-কালভার্ট ভেঙে গেছে। এমন কোনো স্থাপনা নেই যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। আমরা গরিব থেকে আরো গরিব হয়ে গেলাম। এখন দেশকে, দেশের মানুষকে বাঁচাতে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। তবে পরাভব স্বীকার করলে তো চলবে না। যেখানে আমরা মুখ থুবড়ে পড়েছি সেখান থেকেই আবার শুরু করতে হবে। 'যে মাটিতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে।' সরকার বিভিন্ন সেক্টরে (কৃষি, চিকিৎসাসহ) সমন্বিত কাজ শুরু করছে নিশ্চয়ই। এটা তাদের দায়িত্ব। সরকারের কাজের ওপর নির্ভর করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। সকল রাজনৈতিক দল, সামাজিক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। এটা যুদ্ধের সময়। এবার যুদ্ধ মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের। এ যুদ্ধে হেরে যাওয়া চলবে না। বিধ্বস্ত অসহায় মানুষগুলোকে সাহায্য প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সাহস যোগাতে হবে। বিপদগ্রস্ত মানুষেরা সাহস হারিয়ে মরার আগে মরে যায়। সরকার, রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এনজিওগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে জোরেশোরে। দান-অনুদান ও সহায়তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামেগঞ্জে যে ঋণ প্রদান করতে হবে তা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে তার সুদ অত্যন্ত অল্প করে নিতে হবে। আমাদের যার যা আছে তাই নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। হাদিসে আছে যে, যে জাতি নিজেরা নিজেদেরকে সাহায্য করে আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন।

জাহাঙ্গীর চাকলাদার, লালবাগ, ঢাকা-১২১১